



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 310 - 316

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

‘শিলালিপি’ : সময় চিহ্নিত ইতিহাসের আখরমালা অথবা ব্যক্তিগত দ্রোহগাথা

ড. শুভদীপ ত্রিপাঠী

স্বাধীন গবেষক, কোলকাতা

Email ID : imtripathy89@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Politics,
Congress,
Gandhism,
Ain-amanya,
Non-violence,
Revolutionism,
Jugantar,
Communism.

Abstract

Narrator Narayan Gangopadhyay has been a well-known figure in Bengali Literature. His political consciousness is very distinguished. Narayan Gangopadhyay's political ideology and narrative portrayal have often been prominent in the elitist literary canon. Despite all his artistry, Narayan Gangopadhyay's personal life and political ideals and choice leave the readers bewildered about his position as an author. However, his novel *Shilalipi* debunks all the doubts and confusion. In textual hermeneutics, the narrator, on one hand, upholds the trajectory of political history but on the other, the personal self of Narayan Gangopadhyay and his political identity has also immersed with it. Ranjan alias Ranju is the narrator of this novel. His perspective, turmoil and ideology are reflected in each and every segment and possible cessation of the author's life.

Discussion

১

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক ভাবনার সুনির্দিষ্ট রূপ যে কয়টি উপন্যাসের মধ্যে ফুটে উঠেছে ‘শিলালিপি’ তাদের অন্যতম। ব্যক্তি নারায়ণের রাজনৈতিক মত ও পথের কতটা এই আখ্যানের মধ্যে জড়িয়ে আছে তা জানার পূর্বে এই উপন্যাস তার শরীরের মধ্যে কিভাবে রাজনৈতিক ইতিহাসের অক্ষর ধারণ করে আছে তা দেখা জরুরী। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় পৌষ ১৩৫৩ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬ এই কালপর্বের মধ্যে। তিরিশটি সংখ্যায় প্রকাশিত এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র তথা কথক রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ওরফে রঞ্জু। উপন্যাসে নায়ক রঞ্জনের রাজনৈতিক চিন্তাধারার পর্যায়ক্রমিক বিকাশ নিখুঁত ডিটেলসে আঁকা হয়েছে।

সীতার ডাকাডাকি ও নান্দুর স্কুল পালানোর সংবাদে জেগে ওঠা অন্তরীণবন্দি রঞ্জন এর জবানবন্দিতে। অতীত স্মৃতিচারণার মাধ্যমেই এই উপন্যাসের ভূমিকাহীন সূচনা। বন্ধু বাদলের বুদ্ধিতে শৈশবের একটি দিন স্কুল থেকে পালানো, পিতার রক্তচক্ষু স্মরণ, খরগোশ মারতে গিয়ে জঙ্গলে আটকে পড়া এবং অবিনাশবাবু কর্তৃক উদ্ধারের কাহিনী দিয়েই শুরু হয়েছে এই কাহিনীর পথচলা। তারপর কাহিনীর সাথে বেড়ে উঠেছে রঞ্জন - তার জীবন-যাপন, চেতনা-বিশ্বাস সবকিছু।

রঞ্জন শৈশবেই প্রৌঢ় অবিনাশবাবুর থেকে পায় সত্যের পাঠ। রঞ্জুর শিশুমন শুনেছে অবিনাশবাবু স্বদেশী। তিনি কংগ্রেসের কাজ করেন। আর কংগ্রেস রঞ্জুর কাছে একটা স্বপ্নের মত নাম। পুলিশে চাকুরিরত তার বাবার মুখেও শুনেছে কংগ্রেসের নাম ও সম্ভ্রম। শুধু তাই নয় স্কুলে পড়ার সময় অশ্বিনীর মুখে শুনেছে অবিনাশবাবু ও তাঁর স্বদেশী হওয়ার কথা। পাশাপাশি অশ্বিনীর মুখেই রঞ্জন প্রথম শোনে ক্ষুদিরামসহ ‘নিখিলিস্ট’দের কথা –

“মাটির তলায় তাদের বড় বড় কারখানা আছে। সেখানে সব তৈরি হচ্ছে ক্ষুদিরাম সেই বোমা দিয়ে লাটসাহেবকে মেরে ফেলেছিল।”^১

অশ্বিনীর বুদ্ধিতে কংগ্রেস, ‘নিখিলিস্ট’ সব এক হয়ে যায়। কিন্তু রঞ্জনের শিশুমন কংগ্রেস, ‘নিখিলিস্ট’, বোমা, স্বাধীনতা সবকিছু শুনে ঘুমোতে পারেনি। ভেবে গেছে সাত সতেরো। অবিনাশবাবুর কাছে দেখেছে মহাত্মা গান্ধীর ছবি। তারপর বেকুবের মতো প্রশ্ন করেছে ক্ষুদিরামের কারখানার কথা। বলেছে নিয়ে যাওয়ার জন্য যেহেতু অবিনাশবাবুও একই দলের। কিন্তু সেই ছোটবেলাতেই অবিনাশবাবু রঞ্জকে তার পথ যে আলাদা তা পরিষ্কার করে দেন –

“আজ যাঁর ছবি তোমাকে দেখালাম, তিনি স্বদেশী বটে, কিন্তু এ দলের নন। তিনি বলেন, বোমা কামান দিয়ে কখনো অন্যায়কে জয় করা যায় না, তাকে জয় করা চলে ত্যাগে, জয় করা যায় অহিংসায়। আমি সেই মন্ত্রের সাধক। ক্ষুদিরামের কারখানা যদি কোথাও থাকে, তার সন্ধান নেওয়ার অধিকার আমার নেই ভাই।”^২

আত্মাইয়ের তীরে কাটানো সেই শৈশবের সবকিছু মনে না থাকলেও সত্য হিসেবে রয়ে যান অবিনাশবাবু। আর রয়ে যায় তিরিশ সালের বন্যার স্মৃতি – অবিনাশবাবুকে নিজের প্রাণ সাঁপে দিয়ে মানুষকে বাঁচানোর চেষ্টার স্মৃতি। খুচরো স্মৃতি হিসেবে রয়ে যায় উষার সাথে মজার বিয়ে ও নিদারুণ পরিণতি।

রঞ্জনের জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় তার বাবার পদোন্নতি ও বদলির সঙ্গে সঙ্গে। নতুন ঠিকানা হয় মফস্বল শহর মুকুন্দপুর। আর এখানেই রঞ্জু তার জীবনের সামগ্রিক অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে উপলব্ধি করে নিজেকে – মানুষকে – দেশকে। যদিও রঞ্জনের পিতার বদলি ও পদোন্নতি সুখকর হয়নি। তিনি চাকরি হারান। এস.পি.র সাথে গন্ডগোলের জন্য। তারপর আঠারো বছরের চাকরি জীবনের ছেদ টানেন ইউনিফর্ম, টুপি, রাজভক্তির সার্টিফিকেট পুড়িয়ে। এমনকি রঞ্জন সহ তিন ছেলেকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেন –

“জীবনে কখনো ইংরেজদের চাকরি করবে না। আর মনে রাখতে হবে তাদের কাছে ন্যায় নেই, তাদের কোনদিন ক্ষমা করবে না।”^৩

পাড়ার নাম মনসাতলা। এখানেই কিশোর রঞ্জন শুরু করে নতুন করে পথ চলা। এখানেই সমাজের নিচু তলার ভোনা ও তার সাগরেদদের সঙ্গে রঞ্জুর আলাপ। তাদের যাপন, রুচি, ভাষা, নীতিবোধ কোন কিছুই মেলে না রঞ্জুর সাথে। অনিচ্ছায় চুরি করারও সঙ্গী হয়। আবার এখানেই আলাপ হয় পরিমলের সাথে। বড়লোকের ছেলে তাই তার সাথেও একটা সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রাখতে হয় রঞ্জনকে প্রথম দিকে। তার কিছুদিন পরেই শুরু হল সত্যগ্রহ। উনিশশো তিরিশ সাল। উচ্চারিত হল –

“আজ আমরা সংকল্প লইতেছি, ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতীত আমরা নিরস্ত হইব না।”^৪

রঞ্জন দেখল ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে এলো স্কুল-কলেজ থেকে, উকিলরা আদালত থেকে। সে কী স্পর্ধা! ভোনার মতো কদর্য রুচির নিম্নবিত্তরাও পিকেটিং-এ शामिल হল। তিরিশের সেই মুখর দিনগুলি রঞ্জনকে আচ্ছন্ন করে দেয় –

“ঝড়ের গতিতে উড়ে বেরিয়ে গেল আইন-অমান্য আন্দোলনের দিনগুলি। চম্পারণে, মেদিনীপুরে জেগে রইল তার চিরন্তন স্বাক্ষর। কারাগারে নির্যাতনে রক্তপাতে আরো দৃঢ়মূল করে দিয়ে গেল স্বাধীনতার শপথকে; সন্দেহ রইল না যে এবার যাত্রা শুরু, থেমে দাঁড়ানোর উপায় রইল না আর।”^৫

চোখের সামনে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক আন্দোলনগুলি ও তার প্রভাব রঞ্জনের কিশোর চিত্তকে কেবল বিচলিত করেছিল এমন নয়, তাকে তৈরিও করেছিল। অবিনাশবাবুর কাছে সে শুনেছিল গান্ধীবাদের কথা, পরবর্তীতে দেখল গান্ধীর প্রভাব জনমানসে এবং আন্দোলনের ব্যাপকতা। ভোনা, খাঁদু প্রমুখ নিচের সারির লোকদের যা এক ছাতার তলায় নিয়ে

আসে। আবার কিছুদিন পরেই দেখল সেই আন্দোলনের নিদারুণ পরিণতি। গান্ধীর ডাকে আন্দোলনে নামা মৃগাঙ্কও একসময় রঞ্জকে বলে –

“পলিটিকস? - কি হবে? কোন মানে হয় না - ... গাছে তুলে দিয়ে বারবার মই কাড়লে কি আর করা যাবে বলো? ...কেন বুঝিনি বার্দোলির শিক্ষা? চৌরচৌরার মানে? দেবতার পথ দিয়ে মানুষ কখনো চলতে পারে না ...।”^৬

আবার কখনো বা বলেছে –

“It is a betrayal. Betrayal to revolution!”^৭

রঞ্জুর মধ্যেও সেই ভাব লক্ষ্য করা যায়। সবকিছু ছেড়ে কবিতা তাকে আকর্ষণ করে। চট্টগ্রাম প্রেরণা দেয়। ইতিমধ্যে আবার গান্ধীবাদী রঞ্জনকে পরিমল শোনায়ে অন্যরকম কথা –

“অহিংসা দিয়ে এদের রুখতে পারবি রঞ্জু? একটা গোখরো সাপ ফনা তুলে এলে তুই কি হাত জোড় করে বলতে পারবি, দেখো বাপু, হিংসাটা বড় খারাপ, তুমি এই তুলসীপাতাটা খেয়ে বোষ্টম হও, তারপর ঘরে গিয়ে দিনরাত ‘নিতাই গৌর রাধেশ্যাম’ বলে কেতন গাইতে থাকো?”^৮

অহিংস গান্ধী ধারণার বিপক্ষে এই ব্যঙ্গ তৎকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি। পরিমলের সূত্রেই রঞ্জু ‘ফাঁসীর ডাক’, ‘শহীদ সত্যেন’, ‘পথের দাবী’ প্রভৃতি নিষিদ্ধ বই পড়ে ফেলে। অনুভব করে সত্যিকারের পথ মিলে যাওয়ার উত্তেজনা। পরিমলের হাত ধরেই উপস্থিত হয় বিপ্লবীদের আখড়া ‘তরুণ সমিতি’তে। গান্ধীবাদ থেকে বিপ্লববাদে তার আদর্শের উত্তরণ ঘটে। ‘তরুণ সমিতি’র বিপ্লবী নেতা বেনুদার কাছেই তার বিপ্লবমন্ত্রে যথার্থ দীক্ষা। পার্টির নাম ‘যুগান্তর’। অরবিন্দ, বারীন্দ্র, উল্লাসকরদের উত্তরাধিকার যারা বহন করছে। বেনুদা এও স্মরণ করিয়ে দেন –

“চরিত্রহীন আর বিশ্বাসঘাতকের একই বিচার করি আমরা, একই দণ্ড দিই - সে হল মৃত্যু।”^৯

আবার করুণা দি’র স্নেহ ভালোবাসা রঞ্জকে আশ্রিত করে। মিতা তাকে আকর্ষণ করে। তাদের সঙ্গে মেলামেশা রঞ্জন এর মধ্যে দ্বিধার সৃষ্টি করে। করুণাদি স্পষ্ট ভাষায় বলেন –

“তুমি কবি তুমি গুণী। তুমি বাঁচবার চেষ্টা করো, মরার লোভকে জয় করতে চেষ্টা করো। ...এ তোমার পথ নয় ভাই, এ রক্তের পথে তুমি যেয়ো না।”^{১০}

দেশের কাজ, অস্ত্র কেনা বা অর্থ সংগ্রহের জন্য ডাকাতি করা তখনকার বিপ্লবীদের অবশ্য কর্তব্য ছিল। বেনুদার দলও ব্যতিক্রম নয়। রঞ্জনকেও তার অংশীদার হতে হয়। বুঝতে চেয়েছে নিজের মত করে এই পথকে। কঠোর বাস্তব এবং নিজের মধ্যকার অনুভূতির দ্বন্দ্ব ক্ষতবিক্ষত হয়। বিপ্লবের অতীত ব্যর্থতা তাকে বহু প্রশ্নের সম্মুখীন করে –

“নিজের মনকে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে উঠেছে রঞ্জন। বিপ্লবের রঙীন স্বপ্ন, কাজের জটিল পথে এসে ঘা খাচ্ছে বারে বারে। ক্লান্তি, হতাশা, নৈরাশ্য। মৃত্যুর রোমাঞ্চ কেটে গেছে, মাঝে মাঝে পীড়িত বোধ হয় নিজেকে। কতদিন চলবে এইভাবে? শুধু চোরের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে চলা, শুধু ফিসফিস করে কথা বলা, বড় জোর দুটো একটা ডাকাতি আর দিনরাত পৃথিবীশুদ্ধ মানুষকে অবিশ্বাস করে চলা?”^{১১}

শুধুই কি একে অপরকে আর চোখে দেখা? সহজ সম্পর্ক বা স্বাভাবিক জীবনকেও যা ত্যাগ করতে শেখায় তা ক্রমশ কুহেলিকাময় হবেই। ‘বিপ্লবী বাংলার বিপ্লবী কবি’ হওয়ার স্বপ্নদেখা রঞ্জন ক্রমশ নিজেকে খোঁজার চেষ্টা করে চলে। বিপ্লববাদের গোপনীয়তা, সন্দেহ, অবিশ্বাস, হত্যা, দলাদলি, বিভেদ প্রতিটি বিষয় তাকে ক্লান্ত ও পীড়িত করে। অবলম্বিত পথ সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সংশয় রঞ্জনকে বিপর্যস্ত করে দেয়। পুলিশের অত্যাচার, ডাকাতি করতে গিয়ে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য চোখের সামনে বেণুদার মৃত্যু কিংবা আরো পরবর্তীতে আত্মগোপনকালে আশ্রয়দাতা দরিদ্র কৃষক ফৈয়জ মোল্লার ছুঁড়ে দেওয়া প্রশ্ন তাকে নতুন করে সবকিছু ভাবতে বাধ্য করে –

“ইংরেজ গেলে আমিন মুনসীর কাছ থাকি হামাদের জমি জিরাতগলান কি ফিরি আসিবে? পেট ভরি খাবা পামু হামরা? কহেন বাবু, হামারা চাষী মানুষ, সিটাই হামাদের কহেন। ...ইটা যদি না হৈল তো

ফের ইংরাজ গেলেই কি ফের রহিলেই কি? ...হামাদের সব খাই ল্যায় আমিন মুনসী আর মহাজন – ইংরাজ তো ল্যায়না। কহেন, ইংরাজ গেলেই ইগিলা সব মিটবে কী?”^{১২}

উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে যায় রঞ্জু। মানুষকে আরও কাছ থেকে দেখে। আশ্চর্য সব মানুষ। তারপর রঞ্জুর জেল। বন্দীজীবন শুরু। বন্দীজীবনে সে অনুভব করতে শুরু করে পরিবর্তিত স্বপ্নকে –

“এতদিনেই তো আমাদের সত্যিকারের যাত্রা শুরু হয়েছে। এবারে কাজ আলাদা, পথও আলাদা। বাংলাদেশে ফিরে গিয়ে সেই পথেই ধরব আমরা। মধ্যবিত্ত বিপ্লব-বিলাসে আর ক্ষ্যাপামির হাউই ওড়াবো না, প্রাণবন্ত করে তুলব ঘুমন্ত অগ্নিশিখরকে।”^{১৩}

জেল থেকে মুক্তি এবং নতুন পথে যাত্রার আকাঙ্ক্ষা দিয়েই এই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। শেষ পর্বে অত্যাচারী জমিদার সহায়রাম বাবুর বাড়িতে বিদ্রোহী প্রজারা যে আগুন ধরায় সেই আগুনের শিখাই রঞ্জনকে নতুন পথের ইঙ্গিত দেয় –

“ব্যক্তিসত্তা বিসর্জন দিয়ে সে এখন জনসাধারণের সংগ্রামের শরিক হতে চায় – আর নয় ব্যক্তিসত্তার কাহিনী। এতক্ষণে রঙীন বুদ্ধদটা এইবারে মিলিয়ে যাচ্ছে আদিগন্ত খরপ্রবাহে। এরপর সে সকলের। তার ইতিহাস সাড়া দেবে লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী মানুষের সঙ্গে, তার পরিচয় সার্বজনীন প্রাণ-বিক্ষোভ, তার পথের আহ্বান পাঠাচ্ছে ওই রক্তপিঙ্গল শিখালোলুপ আগ্নেয় দিগন্ত।”^{১৪}

২

নেই সাল, তারিখ, মাস ধরে নির্দিষ্ট লিখিত কোন প্রমাণ, যার দ্বারা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে চিহ্নিত করা সম্ভব একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সদস্য হিসেবে। কোন একক রাজনৈতিক দলের শিরোপা তাঁর ছিল না। হ্যাঁ, চৈতন্যবিশিষ্ট মানুষ ও মানবিকতার আদর্শে দীক্ষিত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শৈশবের সূচনা থেকে জীবনের সমাপ্তিপর্ব পর্যন্ত মানব কল্যাণকর রাজনীতির পথকে পাথেয় করে আজীবন এক রাজনৈতিক জীবন কাটিয়েছেন। যেখানে কোন লিখিত দলের বা পার্টির নামের প্রয়োজনীয়তা পড়েনি। এই আলোকেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনকে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। তিনি তাঁর ‘শিল্পীর স্বাধীনতা’ প্রবন্ধে পরিষ্কার করে নিজের বক্তব্যকে, রাজনৈতিক অবস্থানকে প্রকাশ করেছেন –

“আমার চিন্তায় কোন অস্পষ্টতা নেই। আমার যদি কোন দল থাকে – সে আমার স্বদেশ, আমার যদি কোন রাজনীতি থাকে সে আমার ভারতবর্ষ। এবং মান্যতায় আমার যদি কোন বক্তব্য থাকে তাহলে এদের জন্যই নিবেদিত। বহু ভাগ্যে রবীন্দ্রনাথের দেশে জন্ম নিতে পেরেছি – তাঁর জীবন সাধনা আমার আকাশে প্রবতারা হয়ে জ্বলতে থাকুক।”^{১৫}

রবীন্দ্রনাথ ঠিক যেভাবে সময়ের মাঝে, হাজার রাজনৈতিক দলের মাঝে থেকেও, নিরপেক্ষভাবে নিজের রাজনৈতিক মতকে প্রকাশ করেছিলেন। যেখানে ভালো সেখানে সাধুবাদ, আর যা অনৈতিক তার প্রতিবাদ। ঠিক সেই পথেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় চলতে চেয়েছেন। শৈশবের প্রারম্ভেই তাঁর রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। তার দাদা শেখর (মেজদা) সত্যগ্রহ আন্দোলনে অংশ নিয়ে, ১৯৩০ সালে কারাগারে বন্দী হন। এবং এর পরবর্তী সময়ে দাদার সাথে দেশের কাজে ‘যুগান্তর’ গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগ দেন। এরপর কিছু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হন কিন্তু তা খুব বেশি স্পষ্ট নয় তিনি বলেছেন –

“আমি তখন স্কুলের ছাত্র। ত্রিশ সালের সত্যগ্রহ দেখেছি, দেখেছি চট্টগ্রামের বিক্ষোবণ। পড়ছি রবীন্দ্রনাথের ‘নৈবেদ্য’, নজরুলের কবিতা, বাজোয়াপু ‘দেশের ডাক’, ‘ফাঁসির সত্যেন’, আমাদের হাতে ঘুরেছে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের ‘সব হারাদের গান’...।”^{১৬}

ব্যক্তি নারায়ণের এই কাহিনি অদ্ভুত সম্মেল খুঁজে পায় আখ্যানে বর্ণিত রঞ্জুর জীবনভাষ্যে।

সময়ের দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে রাজনৈতিক কর্মে তিনি যুক্ত হয়েছেন ঠিকই, কলমও ধরেছেন সর্বহারার হয়ে, এবং তার জন্য ইংরেজ সরকারের থেকে ক্ষমা পাননি। কি হয়েছিল সেটা খুব স্পষ্টভাবে জানা যায় না। কিন্তু তারপরেও তিনি

সেই আদর্শেই ভাসিয়ে দেননি নিজেকে। বাবার সাথে গ্রামাঞ্চলে খাজনা আদায় করার সূত্রে খুব কাছ থেকে দেখেছেন দরিদ্র মানুষের জীবন, তাদের বেঁচে থাকার যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়েছেন। আর চেয়েছেন তাদের কষ্ট দূর করতে। আরও গভীরে মানুষের যন্ত্রণার হাহাকার তাঁর চোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে –

“দুর্ভিক্ষের অপূর্ব শোভাযাত্রা। সেদিনের সেই অসহ্য আত্মগ্লানি তার যন্ত্রণার মধ্যে বাঙালি লেখকের সঙ্গে আমিও গর্জে উঠেছি। ‘যুগান্তর’-এ লিখেছি ‘নরুচরিত’। আনন্দবাজারে লিখেছি ‘দুঃশাসন’। ‘দেশে’ লিখেছি ‘পুষ্করা’ আর ‘ভাঙা চশমা’।”^{১৭}

প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন, আলোচিত আখ্যানের কেন্দ্রীয় চরিত্রটিও লেখালেখির মধ্য দিয়ে নিজের পথ খোঁজার চেষ্টা করেছে। তার বিপ্লব বা দ্রোহ লেখনির মাধ্যমে ফুটে বেরিয়েছে।

লেখার মাঝেই খুঁজেছিলেন জনজাগরণ ঘটাতে ও জনমানবের যন্ত্রণাকে প্রকাশ করতে। এবং এই সমস্ত কাজই তাঁর চলছে শিক্ষা জীবনের মাঝেই। আর তাঁর শিক্ষাজীবন (কলেজ) যে রাজনৈতিক ঝড়ো হাওয়ার মাঝে কেটেছে তাতে দু একটি কর্মকাণ্ডে (যুগান্তর দলে যোগ, পিস্তল চুরির ঘটনা, রিভলিউশনারি সাসপেন্স হিসাবে অন্তরীণ ইত্যাদি) তাঁকে দেখা গেলেও, তা থেকে কি বলা চলে তিনি দল বা পার্টির হয়ে অংশগ্রহণে নিজের কাজকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। কংগ্রেসি মতাদর্শ ব্যাতিত, যে রাজনৈতিক চেতনা সব থেকে বেশি সেদিন আপামর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মাঝে এক অসম্ভব ঝড় তুলেছিল, তা কমিউনিজম বা মার্কসবাদ। যারা পরবর্তী সময়ে সর্বহারার হয়ে নিজেদের নিবেদন করেছিলেন। আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সেদিন মার্কসবাদ এর প্রতি আস্থা খুঁজতে চেয়েছিলেন। ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের অধিবেশনে যোগ দিতে কলকাতা এসেছিলেন। এবং জানা যায় ৪৬ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রিটে তাঁর যাতায়াত ছিল। পরে ‘পরিচয়’ পত্রিকার লেখক হয়েছিলেন। একথা ঠিক, যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই সাধারণের মধ্যে নিজের কর্মকাণ্ডকে পৌঁছে দিতে চাইবেন। কিন্তু তার জন্য যেমন এটা প্রমাণ হয় না যে তিনি কোনো নির্দিষ্ট পন্থী বা কেবলমাত্র সেই মতকেই প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিবেদিত। দলীয় অংশগ্রহণ সেভাবে চোখে পড়ে না। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে আগ্রহী মানুষের দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান হয়ে যায় তাঁর নিজের জবানবন্দীতে। তিনি নিজের কমিউনিস্ট হওয়ার মত হিসেবে জানান –

“আমি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য নই। কোনদিন ছিলামও না।... আমি পেশায় অধ্যাপক, সুতরাং একটা স্বাভাবিক কৌতূহলেই আরো দশটি জিনিসের সঙ্গে কমিউনিস্ট সম্পর্কেও কিছু পড়াশোনা করেছি। কিন্তু তা নিতান্তই সামান্য। এই আদর্শের কর্মপদ্ধতির সঙ্গেও আমার কোন যোগ নেই।”^{১৮}

তাঁর বক্তব্যের মধ্যে এটাই প্রকাশিত হয়ে যায় বা পরিষ্কার হয়ে যায়, সূচনার মুহূর্তে কমিউনিস্ট দল মার্কসকে আদর্শ করে যে সর্বহারার লড়াইয়ে নেমেছিল, সময়ের সাথে সাথে সেই আদর্শকে তারা ভাঙতে শুরু করেছিলেন। যেখানে মানুষ ছিল প্রধান, পরে কেবল মানুষের স্বার্থই রয়ে গিয়েছিল প্রধান হয়ে। কমিউনিস্ট মত ও পথকে শুরুতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রাধান্য দিয়েছিলেন। শিলালিপি আখ্যান ঠিক এখানে এসেই শেষ হয়েছে। পরের কাহিনি থাকলে হয়তো আমরা রঞ্জুকেও স্রষ্টা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মত কমিউনিজমের সমালোচনা করতে দেখতাম। পরবর্তী সময়ে ব্যক্তি নারায়ণ এই আদর্শের সমালোচনা করেছেন একবারও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় –

“কমিউনিজম?... দেশের শুভাশুভের পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রয়োগ ফলের উপরেই যে কোন মতবাদকেই আমি বিচার করি। আজ দেখছি কমিউনিজম, চৈনিক পররাজ্য-লোলুপতা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিষাক্ত বীজে পরিণত হয়েছে। এই কমিউনিজম আমার শত্রু। আমার দেশের শত্রু, সমস্ত মানবতার শত্রু। আমার লেখায় তার বিরুদ্ধে ধিক্কার সহস্র কণ্ঠে ফেটে পড়ুক।”^{১৯}

নিরপেক্ষভাবে বিচার করার এর থেকে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে। তাই তাঁর জীবনের রাজনৈতিক মতামত এতখানি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হতে পেরেছে –

“আমার কাছে তত্ত্বমুখ্য রাজনীতির কোন সার্থকতা নেই।... আমার দেশের মানুষকে আমি ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি। একদা পজিটিভিস্টরা যেমন বলেছিলেন আমিও তেমনিভাবে যে কোন রাজনৈতিক মতবাদের প্রত্যক্ষ প্রয়োগফল এবং দেশের প্রসঙ্গে তার শুভাশুভের প্রেক্ষিতেই তাকে গ্রহণ করব বা বর্জন করব।

মানুষের জন্যই রাজনীতি, রাজনীতির জন্য মানুষ নয়। যেখানে দেখব দেশের কল্যাণ, দেখব শুভচেতনা তাকে সানন্দে স্বীকার করব।... আমার দেশের কথাই সর্বাত্মক স্বরণ রেখে আমি সত্যকে আচরণ আর মিথ্যাকে পরিহার করবো। নানা চিন্তাধারা থেকে চয়ন করে আমার সামান্য বিচার বুদ্ধিতে তাকে যাচাই করে নিয়ে, নিজস্ব আদর্শকে আমি করে নেব।”^{২০}

এই কথাকে আদর্শ করেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নিজের জীবনকে আগামীর দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। জীবনের প্রারম্ভে কিছু রাজনৈতিক কার্যকলাপে যুক্ত ছিলেন বলেই যেমন তাঁকে দলের সদস্য কর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়া অনুচিত। ঠিক তেমনি কমিউনিজমের কল্যাণকামী কাজে অংশগ্রহণ করলেই তাকে কমিউনিস্ট বলার কোনো যুক্তি নেই। মানুষের যন্ত্রণার ইতিহাসকে আলোর পথের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বারবার তার কলম মুখরিত হয়েছে। আর মানুষের কল্যাণ চিন্তায় রাজনৈতিক মতকে স্বীকার করেছেন, কিন্তু যে মুহূর্তে চিন্তায় ভঙ্গন ধরেছে, তাকে অস্বীকার করতে, সমালোচনা করতে দুবার ভাবেননি। কখনো কোন মত বলিষ্ঠ তখনই হয়ে ওঠে, যখন তা এক পক্ষের হয়ে নয়, নিরপেক্ষ থেকে বিচার করা হয়। আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও নিরপেক্ষ ভাবে রাজনৈতিক মতকে বিচার ও প্রকাশ করেছেন। ওনার সম্পর্কে যে কোন বক্তব্য বা মতামত দেওয়া হোক না কেন, যেখানে লেখক নিজে তাঁর রাজনৈতিক পথের কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন, সেখানে আমাদের সেই বিষয়টিকেই বিশেষ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করতে হবে বইকি। তবে ‘যুগান্তর’ গোষ্ঠীতে যোগদানের যে কথা উল্লিখিত হয়েছে, যেখানে হয়তো একটি প্রশ্ন চিহ্ন, একটু দ্বন্দ্ব থাকতে পারে। পাশাপাশি এটাও ভাবার বিষয়, তিনি দলের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে যদি নিজেকে মনে করেই থাকতেন, তাহলে পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট মতাদর্শ নিয়ে তিনি সমালোচনা বা প্রতিবাদ করতে পারতেন না।

Reference:

১. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, *শিলালিপি*, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কোলকাতা, ৭ম সংস্করণ ১৩৮৪, পৃ. ১০
২. তদেব, পৃ. ১৩
৩. তদেব, পৃ. ৪১
৪. তদেব, পৃ. ৫৫
৫. তদেব, পৃ. ৬৪
৬. তদেব, পৃ. ৬৯
৭. তদেব, পৃ. ১৪৫
৮. তদেব, পৃ. ৭৩
৯. তদেব, পৃ. ১১৮
১০. তদেব, পৃ. ১৩০
১১. তদেব, পৃ. ১৪৫
১২. তদেব, পৃ. ১৯০
১৩. তদেব, পৃ. ২০৪
১৪. তদেব, পৃ. ২১৬
১৫. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, *শিল্পীর স্বাধীনতা*, ‘দেশ’, ২০শে পৌষ ১৯৬৯, পৃ. ৭১-৭২ (দ্রঃ সরোজ দত্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২য় মুদ্রণ ২০১৫, পৃ. ৬)
১৬. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, *শিল্পীর স্বাধীনতা*, ‘দেশ’, ২০শে পৌষ ১৯৬৯, পৃ. ৭০ (দ্রঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৭)
১৭. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, *শিল্পীর স্বাধীনতা*, ‘দেশ’, ২০শে পৌষ ১৯৬৯, পৃ. ৭১ (দ্রঃ সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক যাদ্যাসিক - নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সংখ্যা, দ্বাদশ বর্ষ; ১ম ও ২য় সংখ্যা ১২২১)
১৮. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, *শিল্পীর স্বাধীনতা*, ‘দেশ’, ২০শে পৌষ ১৯৬৯, পৃ. ৭০ (দ্রঃ প্রাগুক্ত)

১৯. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, *শিল্পীর স্বাধীনতা*, 'দেশ', ২০শে পৌষ ১৯৬৯, পৃ. ৭২ (দ্রঃ প্রাপ্ত)

২০. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, *শিল্পীর স্বাধীনতা*, 'দেশ', ২০শে পৌষ ১৯৬৯, পৃ. ৭১ (দ্রঃ প্রাপ্ত)